“ভূমি অধিকার এবং বাংলাদেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সুরক্ষা”

শীর্ষক সেমিনার

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪, সিরডাপ অডিটোরিয়াম, ঢাকা

এএলআরডি, কাপেং ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

.....

আদিবাসীদের ভূমি অধিকার এবং সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতি

মঙ্গল কুমার চাকমা

১. ভূমিকা

আদিবাসীদের জীবন, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ভূমি। সর্বত্রই আদিবাসীরা জমিকে পবিত্র হিসেবে গণ্য করে। ভূমির সাথে এই সম্পর্কের কারণে আদিবাসীরা ভূমিকে ও তার সম্পদের যত্ন নেয়া তাদের পবিত্র দায়িত্ব মনে করে। কেবল নিজেদের স্বার্থে নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থেও তারা তা মনে করে।

আদিবাসীদের চিরাচরিত ভূমি অধিকারের মূল ভিত্তি হচ্ছে ভূমির উপর তাদের সমষ্টিগত মালিকানা। এই পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ ও জনমুখী। আদিবাসী ভূখণ্ডের আওতাধীন সমস্ত জমিজমা এবং বনভূমি ও বনজ সম্পদ আদিবাসীদের সামাজিক সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থপনায় এই সম্পদ এলাকাবাসী একাধারে যৌথ ও ব্যক্তিগতভাবে ভোগদখল করে থাকে। এলাকায় অবস্থিত বনভূমি ও বনজ সম্পদ গৃহস্থলীর প্রয়োজনে যে কেউ আহরণ ও ব্যবহার করতে পারে। অপরদিকে কোন একটা জমিতে বা পাহাড়ে কেউ একবার জুম বা অন্য কোন কিছু চাষ করলে উক্ত জমির উপর ঐ ভোগদখলকারীর ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া কেউ চাষ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে দখল করতে পারে না এটাই হচ্ছে যুগ যুগ প্রচলিত প্রথাগত নিয়ম। এই নিয়ম ভঙ্গ করলে দেশে প্রচলিত দন্ডনীয় অপরাধের মতো আইন লঙ্ঘনের সামিল বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। ফলে এর ব্যতিক্রম কেউ করে না বা ভঙ্গ করার প্রশ্নই উঠে না এবং জায়গা-জমির বন্দোবস্তীকরণের প্রয়োজনও পড়ে না। আজকের যুগে দেশে প্রচলিত বন্দোবস্তীকরণের যে জটিল আইনানুগ ব্যবস্থাপনা চলছে তা আদিবাসীদের সমাজে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তো নয়ই, উপরন্তু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি সম্পর্কে ধারণার সাথে সম্পূর্ণভাবে বিরোধাত্মক বটে।

২. বাংলাদেশের সংবিধান এবং আদিবাসীদের ভূমি ও মৌলিক অধিকার

বাংলাদেশের সংবিধানে আদিবাসীদের ভূমি ও মৌলিক অধিকারের (মানবাধিকার) সরাসরি কোন কিছু উল্লেখ নেই। গত ৩০ জুন ২০১১ জাতীয় সংসদে গৃহীত সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে “বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা” গ্রহণের বিধান করা হয়েছে। “আদিবাসী” শব্দের পরিবর্তে “উপ-জাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়” হিসেবে আখ্যায়িত করায় আদিবাসীরা ইতিমধ্যে পঞ্চদশ সংশোধনীর এই বিধান প্রত্যাখ্যান করেছে। কেননা আদিবাসীদের জাতিগত পরিচিতির ক্ষেত্রে এসব অভিধা অসম্মানজনক ও বিভ্রান্তিকর। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রত্যেক জাতির আত্মপরিচয়ের সহজাত অধিকারকে খর্ব করে এসব অসম্মানজনক ও বিভ্রান্তিকর পরিচিতি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

আরো প্রণিধানযোগ্য যে, আদিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ভূমি সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি ব্যতীত সংবিধানে কেবলমাত্র সংস্কৃতি সংক্রান্ত একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করা সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন ও হাস্যকর। আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির অর্থ হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকার স্বীকৃতি যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবিধানে স্বীকৃতি প্রদানের উদাহরণ রয়েছে।

বর্তমান সরকার কর্তৃক গঠিত সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ সংসদীয় কমিটির সংবিধান সংশোধন প্রক্রিয়া চলাকালে আদিবাসী সংগঠনগুলো আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করার জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ভাগে 'মালিকানার নীতি' সংক্রান্ত ১৩ অনুচ্ছেদে "সমষ্টিগত মালিকানা, অর্থাৎ আদিবাসীদের প্রথাগত আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমষ্টিগত মালিকানা" সংযোজন করার প্রস্তাব করেছিল।

এছাড়া সংবিধানের একাদশ ভাগের (বিবিধ) 'প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি' সংক্রান্ত ১৪৩ অনুচ্ছেদের (২) উপ-অনুচ্ছেদের পরে (৩) নামে নতুন উপ-অনুচ্ছেদ এই মর্মে সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছিল যে- "এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই দেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীদিগকে তাহাদের স্ব স্ব অধ্যুষিত অঞ্চলের ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার ও সমষ্টিগত ভূমি মালিকানার স্বত্বাধিকার নিশ্চিত করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।" কিন্তু সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ সংসদীয় কমিটি আদিবাসীদের এসব মৌলিক অধিকারের কোন কিছুই বিবেচনায় নেয়নি।

সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না" বলে উল্লেখ রয়েছে এবং সাধারণভাবে দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী জাতিগুলোকে "নাগরিকদের অনগ্রসর অংশ" হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্র আদিবাসীদের জন্য তাদের চিরাচরিত ভূমি অধিকার সংরক্ষণসহ যে কোন বিশেষ সংবিধিব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

বাংলাদেশের সংবিধানে প্রথম তফসিলে বর্ণিত প্রচলিত আইন হিসেবে সরাসরি '১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সালের আইন নং ২৮)' এবং পরোক্ষভাবে '১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি' বহাল রাখা হয়েছে। উক্ত দু'টো আইন ও বিধিমালায় আদিবাসীদের বিশেষ ভূমি অধিকারের বিধান রয়েছে। ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন অনুসারে জেলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতিত আদিবাসীদের জায়গা-জমি অআদিবাসী বা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নিকট হস্তান্তরে বাধানিষেধ রয়েছে। অপরদিকে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিতে বসতবাড়ি, ভূমি এবং বন সম্পদের উপর আদিবাসী পাহাড়ীদের প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। এছাড়া ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি হস্তান্তর এবং পরিষদের পূবানুমোদন ব্যতীত হস্তান্তর, ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, অধিগ্রহণের বিধিনিষেধ রয়েছে।

৩. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও আদিবাসীদের ভূমি অধিকার

বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ১৯৫৭ সালের আদিবাসী ও জনজাতি বিষয়ক কনভেনশন (কনভেনশন নং ১০৭) অনুস্বাক্ষর করেছে। উক্ত কনভেনশনের ১১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, "সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্যদের ঐতিহ্যগতভাবে অধিকৃত ভূমির উপর যৌথ কিংবা ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকার করতে হবে।" আদিবাসীদের চিরাচরিত বা প্রথাগত ভূমি অধিকারের মূল ভিত্তি হচ্ছে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর যৌথ বা সমষ্টিগত মালিকানা। রাষ্ট্র আইএলও'র ১০৭নং কনভেনশন অনুস্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের চিরাচরিত বা প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে।

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্রের ২৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, (১) আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর তাদের ঐতিহ্যগতভাবে মালিকানাধীন, ভোগদখলে থাকা কিংবা অন্যথায় ব্যবহায করা কিংবা অধিগ্রহণকৃত জমি, ভূখন্ড ও সম্পদের অধিকার রয়েছে; (২) আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত মালিকানা কিংবা ঐতিহ্যগত ভোগদখল, ব্যবহার, এবং একই সাথে অন্যথায় অধিগ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত ভূমি, ভূখন্ড ও সম্পদের উপর তাদের মালিকানা, ব্যবহার, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে; ও (৩) রাষ্ট্র এসব ভূমি, ভূখন্ড ও সম্পদের আইনগত স্বীকৃতি ও সুরক্ষা করবে। সংশ্লিষ্ট আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রথা, ঐতিহ্য এবং ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার যথাযথ মর্যাদা দিয়ে সেই স্বীকৃতি প্রদান করবে। এমনকি উক্ত ঘোষণাপত্রের ১০ অনুচ্ছেদে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে তাদের ভূমি কিংবা ভূখন্ড থেকে জবরদস্তিমূলকভাবে উৎখাত করা যাবে না বলেও উল্লেখ রয়েছে। আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে তাদের স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি ছাড়া কোনভাবে অন্য এলাকায় স্থানান্তর করা যাবে না এবং ন্যায্য ও যথাযথ ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে সমঝোতাসাপেক্ষে স্থানান্তর করা হলেও, যদি কোন সুযোগ থাকে, পুনরায় তাদেরকে স্ব-এলাকায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা থাকতে হবে বলে ঘোষণাপত্রে বিধান করা হয়েছে।

৪. সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার এবং সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা

২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের ১৮.১ ধারায় প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে যে, "আদিবাসীদের জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতনি অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশন গঠন করা হবে।" ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের ২২.১ ধারায় বলা হয়েছে যে, "ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের জমি, বসতভিটা, বনাঞ্চল, জলাভূমি ও অন্যান্য সম্পদের সবু ক্ষা করা হবে। সমতলের ক্ষদ্ু্র ন-্ গোষ্ঠীর জমি, জলাধার ও বন এলাকায় অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশনের কার্যμম অব্যাহত থাকবে।"

ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ সরকার সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের বেহাত হওয়া ভূমি উদ্ধারের জন্য ভূমি কমিশন গঠনের এভাবে দু' দু' বার নির্বাচনী অঙ্গীকার প্রদান করলেও ২০০৯ সালে আজ অবধি বিগত ৬ ছর বছরে এ বিষয়ে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পক্ষান্তরে সরকারী উদ্যোগে তথাকথিত ইকো-পার্ক, জাতীয় উদ্যান, সাফারী পার্ক, সংরক্ষতি বরাঞ্চল ইত্যাদি নামে সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের চিরায়ত ভূমি অধিকারকে খর্ব করেছে। অপরদিকে প্রভাবশালী ভূমিদূস্যদের নানাভাবে মদদ দিয়ে আদিবাসীদের ভূমি জবরদখলে ভূমিখেকো প্রভাবশালীদের ইন্ধন দিয়ে চলেছে।

গত চার দশকে দেশের আদিবাসী ও সংখ্যালঘু হিন্দুদের যেসব সম্পত্তি দখল হয়েছে সেগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার অর্পিত সম্পত্তি (পুনরুদ্ধার) ২০১১ আইন করেছে। কিন্তু সংশোধিত আইনে 'খ' তালিকা নামে অর্পিত সম্পত্তির একটি তালিকা অন্তর্ভুক্ত করায় আরো এক জটিলতা সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে প্রবল আপত্তির মুখে অর্পিত সম্পত্তি (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর মাধ্যমে উক্ত 'খ' তালিকা বিলুপ্ত করা হলেও এখনো অর্পিত সম্পত্তির নামে সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের বেহাত হওয়া ভূমি এখনো প্রত্যর্পণের কাজ অগ্রগতি লাভ করেনি। এখনো পর্যন্ত প্রকৃত মালিকদের কাছে জমি ফিরিয়ে দেওয়ার এই প্রক্রিয়া যথাযথভাবে শুরু হয়নি। সমতল অঞ্চলে শত শত আদিবাসী পরিবার অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতায় ভূমি সমস্যার মধ্যে রয়েছে। অপরদিকে প্রকৃত মালিকদের কাছে জমি ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আদিবাসীদের দাবী অনুসারে এই আইন যথার্থ নয় বলে আদিবাসীদের অভিযোগ রয়েছে।

৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও আদিবাসী পাহাড়ীদের ভূমি অধিকার

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও আদিবাসী পাহাড়ীদের রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি মোতাবেক পার্বত্যাঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা পুনপ্রবর্তিত হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে সাধারণ প্রশাসন তত্ত্বাবধান, আইন-শৃঙ্খলা, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পুলিশ (স্থানীয়), সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত নয় বন ও পরিবেশ ইত্যাদিসহ ৬৮টি কর্ম সম্বলিত ৩৩টি বিষয় হস্তান্তরের বিধান রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সংশোধিত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে বলা হয়েছে যে, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাবে না। এছাড়া পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও এর সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তরে বাধানিষেধ রয়েছে। অধিকন্তু 'ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা' বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরের বিধান রয়েছে।

অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে অবসরপ্রাপ্ত নেতৃত্বাধীন ভূমি কমিশনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করার বিধান রয়েছে। এ চুক্তিতে আরো বলা হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুয়ায়ী কমিশন বিরোধ নিষ্পত্তি করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের একদিন আগে ২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন জাতীয় সংসদে পাশ করে। উক্ত আইনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক ১৯টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। এসব

বিরোধাত্মক ধারার মধ্যে বিশেষ করে কমিশনের কার্যপরিধি, বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যপদ্ধতি, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত 'আইন, রীতি ও পদ্ধতি' কেবলমাত্র 'আইন ও রীতি' অন্তর্ভুক্ত করা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখযোগ্য।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর উক্ত বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য ৭ মে ২০০৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তরফ থেকে সরকারের নিকট পুনরায় সুপারিশমালা প্রেরণ করা হয়। উক্ত সংশোধনী প্রস্তাবের উপর বিভিন্ন স্তরে একের পর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এক পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধিদলের সাথে যৌথভাবে যাচাইবাছাই পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৩ দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্ত করে বিল আকারে মন্ত্রী সভা ও জাতীয় সংসদে উত্থাপনের জন্য গত ২০ জুন ২০১১ ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এরপর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির কাছে পাঠানো হলে ২২ জানুয়ারি ২০১২ ও ২৮ মে ২০১২ অনুষ্ঠিত চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম সভায়ও উক্ত ১৩ দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ তৎকালীন আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদের সভাপতিত্বে ৩০ জুলাই ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত ১৩-দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এর ধারাবাহিকতায় গত ১৬ জুন ২০১৩ উক্ত সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়েছে এবং মতামত চেয়ে উক্ত বিল ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত বিলে ১৩ দফা সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে মাত্র ১০টি সংশোধনী প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাকী ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে বাদ দেয়া হয়েছে এবং অপরদিকে উত্থাপিত ১০টি সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে ২টি সংশোধনী প্রস্তাব উক্ত বিলে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন যথাযথভাবে সংশোধনকল্পে উক্ত বিলের উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে ১৮ জুন ২০১৩ সরকারের নিকট পাঁচদফা সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু সরকার শেষ পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৩ বিলও অবশেষে তা সংসদীয় কমিটিতে ঝুলিয়ে রেখে দেয়।

অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন-২০০১ এর বিরোধাত্মক ধারাসমূহ সংশোধনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং অচিরেই সংশোধন করা হচ্ছে বলে সরকার পক্ষ বড় গলায় দেশে-বিদেশে সাফাই গেয়ে আসছে। বিশেষ করে ২০১৩ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ইউপিআর অধিবেশনে তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডা: দীপু মণি বেশ জোর দিয়ে এমন সাফাই গেয়ে আন্তর্জাতিক মহলকে এক প্রকার বোকা বানানোর চেষ্টা করেছেন। ভূমি কমিশন আইন প্রণয়ন বা সংশোধান নিয়ে সরকার জনগণের সাথে একের পর এক ভেলকিবাজি চালালেও সরকারের প্রবঞ্চনার ষড়যন্ত্র সহজেই জনমনে ধরা পড়ে তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ২০০১ সালেও সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন জাতীয় সংসদে পাশ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব মুহূর্তে আর পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ও পরামর্শ না করে। একই কায়দায় ২০১৩ সালেও সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে সরকার ভূমি কমিশন আইনের সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করে। বস্তুত: পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন বা সংশোধন নয়; মূলত: জনমতকে বিভ্রান্ত করা, নির্বাচনে ভোটারদের প্রভাবিত করা, সর্বোপরি লোক দেখানো উদ্যোগ নিয়ে সস্তা বাহবা কুড়ানোর হীন উদ্দেশ্যেই এভাবে সরকার প্রত্যেক বারই মেয়াদ শেষ ঠিক আগ মুহূর্তে ভূমি কমিশন আইনের বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করে আসছে। ফলে চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৭ বছর ধরে এখনো এই ভূমি কমিশন আইন যথাযথভাবে প্রণীত বা সংশোধিত হয়নি বা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ একবিন্দুও অগ্রগতি লাভ করেনি। বরঞ্চ প্রত্যেক বারই এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হলে সরকার এক একটি নতুন সমস্যার জন্ম দিয়ে থাকে।

অতিসম্প্রতি আগস্ট মাসে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে আনোয়ারুল হক নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে নিয়োগ দিয়েছে। কিন্তু ভূমি কমিশন আইন সংশোধন না করে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়া অর্থহীন ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত।

৬. ভূমি জবরদখল এবং সাম্প্রতিক ঘটনা

বস্তুত: আদিবাসী চিরায়ত ভূমি অধিকার দেশের প্রচলিত আইনে স্বীকৃতি থাকলেও তার বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ উল্টো বলা যায়। আদিবাসীদের চিরাচরিত ভূমি অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘন করে তাদের স্বাধীন ও পূর্বাবহিত পূর্বক সম্মতি

ব্যতীত তাদের ভূমি ও ভূখণ্ডে সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা, অস্থানীয়দের অভিভাসন, নানা উন্নয়ন প্রকল্পের নামে তাদের ভূমি, বন ও পাহাড় কেড়ে নেয়া হচ্ছে।

১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইনকে লঙ্ঘন করে দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের যোগসাজসে অসাধু উপায়ে সমতল অঞ্চলে আদিবাসীদের জমিজমা অআদিবাসীদের নিকট হস্তান্তরিত হচ্ছে। ইকো-পার্ক, জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, কয়লা-তেল-গ্যাস উত্তোলনের নামে চিরায়ত জমিজমা থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর একটি ভূমিগ্রাসী প্রভাবশালী গোষ্ঠী আদিবাসীদের জমি ছলে-বলে-কৌশলে জবরদখল করে চলছে। প্রশাসনের দারস্থ হলেও তার কোন প্রতিবিধান পাওয়া যায় না। প্রশাসন তথা রাষ্ট্র আদিবাসীদের ভূমি সংরক্ষণে এগিয়ে আসে না বললেই চলে। প্রথাগত ভূমি অধিকার সংরক্ষণে লড়াইসংগ্রাম করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে আলফ্রেড সরেন, পিরেন স্নাল, গিতিদা রেমা, চলেশ রিচিল প্রমুখ আদিবাসী অধিকার কর্মীদের।

অতি সম্প্রতি ২ আগস্ট দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে ভূমিগ্রাসীদের হামলায় একজন আদিবাসী সাঁওতালকে হত্যা করা হয়েছে। প্রভাবশালী ভূমিদস্যু কর্তৃক আদিবাসীদের ভূমি জবরদখলকে কেন্দ্র করে গত জানুয়ারী থেকে জুন মাসের মধ্যে ১০৬টি আদিবাসী পরিবার আক্রান্ত হয়েছে এবং এতে ৪২ জন হতাহতের শিকার হয়েছে। গত ৩০ মে স্থানীয় বাঙালি ভূমিদস্যুরা আদিবাসী খাসিদের জমি দখল করার উদ্দেশ্যে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার খাসিদের গ্রাম নাহার পুঞ্জির ৭৯টি খাসি পরিবারের উপর আক্রমণ করে। গত ৯ মে দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান গং নিরীহ সাঁওতাল আদিবাসী শ্রমিকদের উপর হামলা চালিয়ে অন্তত: ৭ জন নারীসহ ১১ জনকে আহত করে। নারী ও শিশুসহ আদিবাসীদের উপর সহিংসতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো এসব মানবতা বিরোধী সহিংসতায় জড়িত অপরাধীদের বিচারের আওতায় না আনা। বস্তুত: অপরাধীরা পার পেয়ে যাওয়ায় সারা দেশে আদিবাসীদের উপর সহিংসতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা সমাধান না করে এবং পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের উচ্ছেদ করে সরকার বর্তমানে বিজিবি, সামরিক বাহিনী বা আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প সম্প্রসারণ, সেনাবাহিনীর তথাকথিত পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, রক্ষিত/সংরক্ষিত বন ঘোষণা, সেটেলার বাঙালিদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারনের নামে ভূমি অধিগ্রহণ এবং বহিরাগত ব্যবসায়ী/প্রভাবশালী ব্যক্তি/ভূমিগ্রাসীদের ভূমি জবরদখলে মদদ ও সহায়তা দিয়ে চলেছে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়ায় ২১টি জুম্ম পরিবারকে উচ্ছেদ করে এবং একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দখল করে বিজিবির ব্যাটেলিয়ন সদর দপ্তর স্থাপনের উদ্যোগ এবং রুমা উপজেলার পাইন্দু মৌজা ও পলি মৌজার পাইন্দু পাড়া, চান্দু পাড়া ও চাইপো পাড়ার প্রায় ৫০০ মারমা পরিবারকে উচ্ছেদ করে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন, রোয়াংছড়ি উপজেলায় রামজাদি জায়গা দখল করে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ; যার মধ্যে বাবুছড়ায় জুম্ম গ্রামবাসী ও বিজিবি-পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা সারাদেশে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। সেনাবাহিনীর মাধ্যমে দু'টি গ্রামের ৬৫টি জুম্ম পরিবার উচ্ছেদ করে বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেকের রুইলুং গ্রামে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন; রুমা উপজেলায় বম অধিবাসী উচ্ছেদ করে অনিন্দ্য পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন; বান্দরবান সদর উপজেলায় ডোলা ম্রো পাড়া (জীবন নগর), কাপ্রু পাড়া (নীলগিরি), চিম্বুক ষোল মাইল, ওয়াই জংশন (বারো মাইল) ও কেওক্রুডং পাহাড়ে ৬০০ একর জায়গা দখল করে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাঘাইছড়ির দ্বিটিলা এলাকায় ও গঙ্গরাম দোয়ারে প্রথাগত ভূমিতে বৌদ্ধ মূর্তি নির্মাণে সেনাবাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসন বাধা দিয়ে চলেছে। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও জুম্মদের প্রথাগত ভূমি অধিকারকে লঙ্ঘন করে বনবিভাগ কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলায় ২০টি মৌজায় প্রায় ৫৩,০০০ একর মৌজা ভূমি সংরক্ষিত বন ঘোষণার মরিয়া ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে। নাইক্ষ্যংছড়িতে ২১টি চাক পরিবারকে উচ্ছেদ করে বহিরাগত প্রভাবশালী কর্তৃক তাদের জায়গা-জমি জবরদখল ও কামিছড়া মৌজায় প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান ফারুক আহমেদ কর্তৃক ব্যাপক জুম ভূমি দখল; ত্রাস সৃষ্টি করে উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে লামায় জুম্ম গ্রামবাসীর উপর বহিরাগত ভূমিদখলদারদের হামলা এবং লামা উপজেলার লুলেইন মৌজার ২৫০টি ম্রো পরিবারকে উচ্ছেদের হুমকি; লামায় জনৈক লাদেন গ্রুপ কর্তৃক ফাস্যাখালি ইউনিয়নের ৭৫টি ম্রো, ত্রিপুরা, মারমা ও স্থায়ী বাঙালি পরিবার উচ্ছেদ করে ১৭৫ একর জায়গা জবরদখল এবং আরো ২২১টি পরিবারকে উচ্ছেদের হুমকি; মুজিবুল হক গং কর্তৃক মারমা গ্রামবাসীর উপর হামলা চালিয়ে লামা উপজেলার রুপসী ইউনিয়নে প্রায় ৫০০ একর জায়গা দখলের অপচেষ্টা; রোয়াংছড়ি উপজেলায় একটি বহিরাগত বাঙালি কর্তৃক ৩৩টি মারমা পরিবারের রেকর্ডীয় জমি জালিয়াতির মাধ্যমে বন্দোবস্তকরণ ও জবরদখলের অপচেষ্টা; আলিকদম উপজেলায় বদিউল আলম নামে জনৈক প্রভাবশালী কর্তৃক ম্রো, ত্রিপুরা ও মারমা পরিবারের প্রায় ১,০০০ একর রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয়

জমি জবরদখল ইত্যাদি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যা রাষ্ট্রযন্ত্রের মদদে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জবরদখলের ক্ষেত্রে মৎস্যন্যায়ের অবস্থার চিত্র ফুটে উঠে।

ভূমি জবরদখলের উদ্দেশ্যে নিম্নে অতি সম্প্রতি সংঘটিত আলোচিত ঘটনা উল্লেখ করা হলো-

ঘটনা-১: চাঁপাইনবাবগঞ্জে আদিবাসী নেত্রীর উপর হামলা

গত ৪ আগস্ট ২০১৪ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলায় জমিজমা নিয়ে বিরোধের জেরে আদিবাসী নারী ইউপি সদস্যকে মারধর ও ধর্ষণ করা হয়েছে। জানা যায়, পার্বতীপুর ইউনিয়নের নারী ইউপি সদস্য ও আদিবাসী নেত্রী তার জিনারপুর মৌজার ৬ বিঘা জমিতে আমন ধান রোপণের জন্য প্রস্তুত করার সময় সেদিন দুপুর ১২টায় জিনারপুর গ্রামের আফজাল হোসেন, মনিরুল ইসলাম, আব্দুল হামিদ, আবুল কালাম, আব্দুস সালাম, তরিকুল ইসলাম ও শেরপুর গ্রামের আক্তারসহ ৩০-৩৫ জনের একটি দল হাঁসুয়া, লাঠি, কোদাল নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় ভূমিদস্যুরা কোদালের বাঁট দিয়ে ইউপি নারী সদস্যকে বেদম মারধর করে। হামলাকারীরা মহিষ, শ্যালো মেশিন ও পাওয়ার টিলার লুট করে নিয়ে যায়। অন্যদিকে মনিরুল ইসলাম (৪৮), আবুল কালাম (৪৫) ও আক্তার (৪০) আদিবাসী নারী ইউপি সদস্যকে টেনেহিঁচড়ে ফাঁকা মাঠের কিনারে নিয়ে বেদম মারধর ও যৌন হয়রানি করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে আলোচনার ঝড় উঠে। আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের আহ্বায়ক ফজলে হোসেন বাদশাহ এমপি কর্তৃক জাতীয় সংসদে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে। কয়েকজন সংসদ সদস্য এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদল সরেজমিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও ঘটনার শিকার আদিবাসী নেত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। জাতীয় আদিবাসী পরিষদের নেতৃত্বে আদিবাসী জনগণ, প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, নাগরিক সমাজের উদ্যোগে দীর্ঘ ৭০ কিরোমিটার ব্যাপী পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও পুলিশ এ ঘটনার মূল হোতাদের গ্রেফতার করেনি। আরো উদ্বেগজনক যে, ঘটনার অব্যবহিত পর পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করলেও অতি সম্প্রতি তারা জামিনে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে। ভূমিদূস্যরা প্রতিনিয়ত ঘটনার শিকার আদিবাসী নেত্রীকে থানায় দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের হুমকি দিয়ে চলেছে। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন তথা সরকারকে এ বিষয়ে অনেকাংশ নির্লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। এভারে ভূমিগ্রাসীরা দায়মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে এবং ফলশ্রুতিতে আদিবাসী ভূমি জোরপূর্বক কেড়ে নিয়ে উৎসাহিত হচ্ছে।

ঘটনা-২: মৌলবীবাজারে খাসিপুঞ্জিতে হামলা ও মিথ্যা মামলা

গত ৩০ মে ২০১৪ স্থানীয় বাঙালি ভূমিদস্যুরা আদিবাসী খাসিদের জমি দখল করার উদ্দেশ্যে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার খাসিদের গ্রাম নাহার পুঞ্জির ৭৯টি খাসি পরিবারের উপর আক্রমণ করে। সেদিন দুপুর ১২:০০ ঘটিকায় লাঠিসোটা, ধারালো অস্ত্র নিয়ে নাহার চা বাগান থেকে হামলাকারীরা আদিবাসী গ্রামে হামলা করে। তারা প্রথমে সদ্য নির্মিত আদিবাসীদের একটি বাড়িও ভেঙ্গে দেয় এবং উক্ত স্থানে তারা একটি নতুন বাড়ি নির্মাণ করে। এতে নাহারপুঞ্জির সহকারী মন্ত্রি দিবারমিন পোহতাম এর স্ত্রী আসরিন পোষায়াদ (২৮) বাধা দিলে হামলাকারীরা তার উপর চড়াও হয়। এ সময় গ্রামের আদিবাসীরা তাকে উদ্ধার করতে গেলে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। এতে কমপক্ষে পাঁচজন আদিবাসী খাসি গ্রামবাসী আহত হন। পরে আদিবাসী খাসি গ্রামবাসীরা সংগঠিত হয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে এবং হামলাকারীদের লক্ষ্য করে হট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এ সময় হামলাকারী হুড়াহুড়ি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকজন আহত হয় বলে জানা গেছে।

উল্লেখ যে, আদিবাসী খাসিরা ইউনিয়ন পরিষদে নিয়মিত কর পরিশোধ করে এসব জায়গা-জমিতে বিগত কয়েক দশক ধরে ভোগদখল করে আসছে। ১৯৬৪ সালে নাহার চা বাগান মালিক কর্তৃক ইজারা নেয়ার অনেক পূর্ব থেকে আদিবাসী খাসিরা গ্রামবাসীরা উক্ত এলাকায় বসবাস করে আসছে। অথচ চা বাগানের মালিক অবৈধভাবে খাসিদের জায়গা-জমির মালিকানা দাবি করছে। ৬০০ এর অধিক আদিবাসী খাসি ও গারো জনগোষ্ঠী এই ১ ও ২ নং খাসি পুঞ্জিতে বসবাস করে।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আদিবাসী খাসিরা মামলা করলেও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি, এমনকি গ্রেফতারের চেষ্টাও করেনি। উল্টো প্রভাবশালী হামলাকারীরা আদিবাসীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় আদিবাসীদের হয়রানি করে চলেছে। অধিকন্তু গত ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ হামলাকারী চা বাগানের কর্তৃপক্ষ আরেকটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে।

বর্তমানে শ্রীমঙ্গল উপজেলার নাহার খাসিয়াপুঞ্জির আদিবাসীরা চা বাগান কর্তৃপক্ষের করা মিথা মামলার কারণে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মৃত খাসি ব্যাক্তির নামেও মামলা হয়েছে। খাসিপুঞ্জি হামলার ঘটনায় মামলা হলেও সেই মামলা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

খাসিপুঞ্জিতে বসবাসরত আদিবাসী পরিবারগুলো এখনো আতঙ্কে রয়েছে। হামলার ঘটনায় মামলা হলেও প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করছে। হামলার পর নাহার খাসিয়াপুঞ্জিতেও থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। খাসিয়াদের একমাত্র জীবিকা পান উত্তোলন ও বিক্রি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাঁরা চা-বাগানের রাস্তা দিয়ে চলাচল করার সাহস পাচ্ছেন না।

ঘটনা-৩: মৌলভীবাজারে ৩টি আদিবাসী পরিবারের বসতঘর পুড়িয়ে উচ্ছেদ

গত ৮ আগস্ট ২০১৪ মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার কালেঙ্গা বিটের কৃষ্ণচূড়া এলাকার আদিবাসী ৩টি পরিবারের বসতঘর পুড়িয়ে তাদের বসতভিটে থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। উচ্ছেদকৃত ৩টি পরিবার সব হারিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় পার্শ্ববর্তী বাড়িঘরে আশ্রয় নিয়েছে। এ অবস্থায় ওই এলাকার অন্য আদিবাসী পরিবারগুলো উচ্ছেদ আতঙ্কে ভুগছে।

আদিবাসীদের অভিযোগ, কালেঙ্গা বিট কর্মকর্তা মাহবুব কারারের মৌখিক নির্দেশে ফরেস্টার খুরশেদ আলম খানের নেতৃত্বে এ হামলা চালানো হয়। এরপর থেকে অন্য আদিবাসী পরিবারগুলোকেও উচ্ছেদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। উচ্ছেদকৃত পরিবার আলবিনা কারিয়া, শুকুর মনি কারিয়া, শিবানী কারিয়া, সোনামনিসহ এলাকাবাসী জানান, বিট কর্মকর্তার নির্দেশে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে।

ঘটনা-৪: দিনাজপুরে আদিবাসী পিতার পরে এবার পুত্রকেও পিটিয়ে হত্যা

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার কুশদহ ইউনিয়নের ডেড়কামারি গ্রামের আদিবাসী ঢুডু সরেন'কে (৫০) পিটিয়ে হত্যা করেছে স্থানীয় ভূমিগ্রাসীরা। একই ইউনিয়নের কচুয়া গ্রামের আব্দুল গাফফার (৪০) ও আজগর আলী (৪৭) এর নেতৃত্বে তাদের পরিবারের লোকজন ঢুডু সরেনকে হত্যার উদ্দেশ্যে মারপিট করে বলে জানা গেছে। এর আগে ১৯৭৩ সালে তার পিতা ফাগু সরেনকেও একই পরিবারের ভূমিগ্রাসীরা হত্যা করে।

জানা গেছে, সেদিন সকালে ঢুডু সরেন তার সাইকেল মেরামত করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় কুশদহ বাজারে যায়। সেখান থেকে সকাল ৮টার দিকে বাড়িতে ফেরার পথে কচুয়া গ্রামে আসলে ওই গ্রামের বাসিন্দা আজগর আলী তাকে সাইকেল থেকে ঠেলে ফেলে দেয়। এরপর টেনে হিচড়ে তাকে তার ভাই আব্দুল গাফফারের বাড়িতে নিয়ে যায়। ঘটনাটি আলতাফ হোসেন নামে এক ব্যক্তি দেখে ফেললে সে ঢুডু সরেনের বাড়িতে খবর দিলে ঢুডু সরেনের ছেলে মিলন সরেন (২৫) তার বাবাকে উদ্ধার করতে আসলে তাকেও লাঠি দিয়ে তাড়া করা হয়। কিছুক্ষণ পর আরো লোকজন নিয়ে ঘটনাস্থলে আসলে ঢুডু সরেনকে অচেতন অবস্থায় ভূমিগ্রাসীদের বাড়ী থেকে একটু দূরে পা বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়। পরিবারের লোকজন দ্রুত তাকে ফুলবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার কথা বলেন। এরপর তাকে রমেক হাসপাতালে নিলে দুপুরে তার মৃত হয়। এ ঘটনায় ঢুডু সরেণের ছেলে রবি সরেন নবাবগঞ্জ থানায় আবদুল গফ্ফার, তার বড় ভাই আজহার আলী, ছোট ভাই দেলোয়ার, আবদুল হালিমসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

আরো জানা যায় যে, দীর্ঘদিন থেকে ঢুডু'র পরিবারের সাথে আব্দুল গাফফারের পরিবারের জমিজমা নিয়ে গন্ডগোল চলছিল। এর জেরেই তাকে হত্যা করা হয়েছে। ঢুডু সরেনের সাথে ভূমিগ্রাসী আব্দুল গাফফার ও তার পরিবারের দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা সংক্রান্ত মামলা চলছে। এর আগে জমিজমার বিরোধের জেরে একই প্রতিপক্ষের হাতে ১৯৭৩ সালে ঢুডু সরেনের পিতা ফাগু সরেনও নিহত হয়েছেন। গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পুলিশ ঢুডু সরেনের মূলহত্যাকারী হিসেবে অভিযুক্ত আবদুল গফ্ফারকে (৪৫) ঢাকার গাজিপুরের ইউসুফ মার্কেট থেকে গ্রেফতার করে।

ঘটনা-৫: পটুয়াখালি ও বরগুনা অঞ্চলের রাখাইনরা জমি হারাচ্ছে

পটুয়াখালি ও বরগুনা অঞ্চলের রাখাইন আদিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছেন। কুয়াকাটায় রাখাইনরা হারাতে বসেছে। রাখাইনরা প্রথম এ এলাকায় কুয়া খনন করেছিল তাই নাম হয়েছে কুয়াকাটা। অধিকাংশ রাখাইন আদিবাসী নিজভূমে আজ দেশান্তরী, বিপদাপন্ন, শঙ্কটাপন্ন, বলা যায় সংখ্যালঘু নয় বরং তারা

সংখ্যাশূন্য হতে চলেছে। ১৭ শতকের শুরুতে এ অঞ্চলে প্রথম বসতি গড়তে যারা বনজঙ্গল কেটে আবাদিজমি তৈরি করে অঞ্চলকে বসবাসযোগ্য করেছিল, যেখানে কয়েক দশক আগেও লক্ষাধিক রাখাইনের পদচারণায় মুখরিত ছিল সেখানে তাদের সংখ্যা বর্তমানে মাত্র আড়াই হাজারে নেমে এসেছে। ১৯৪৮ সালে পটুয়াখালিতে ১৪৪টি ও বরগুনাতে ৯৩টি রাখাইনপাড়া ছিল, বর্তমানে সেখানে যথাক্রমে ২৬টি ও ১৩টি পাড়া টিকে আছে। কতটা অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতন ও ভূমিদস্যুতার শিকার হলে মানুষের সংখ্যা এমনভাবে কমে যায় এটি তারই দালিলিক প্রমাণ।

রাখাইনদের জমিজমা বেহাত, নারীনির্যাতন ও নানাধরনের নিপীড়ন চলছে। বরগুনা জেলার তালতলি উপজেলার কবিরাজপাড়ার রাখাইনদের ২০০ বছরের পুরনো পুকুর আজ দখলের পাঁয়তারা চলছে; নানা আতঙ্কের মধ্যে তারা বাস করছেন। সুপেয় পানির জন্য রখাইনরা তাদের পল্লীর সন্নিকটে এই পুকুর খনন করেছিলেন। এক সময় তারাই এ এলাকায় প্রায় সকল জমির মালিক ছিলেন। কালক্রমে প্রভাবশালীদের ক্ষমতা, হয়রানি, পেশিশক্তির ব্যবহার, হুমকি ধামকির ফলে জমি হারাতে হারাতে এখন প্রায় ভূমিহীন হয়ে গেছেন। নিজস্ব ভূমি রক্ষা করার পরিবর্তে উল্টো তাদেরই বিরুদ্ধে ভূমিদস্যুরা ৩-৪টি করে মিথ্যে মামলা দায়ের করেছে; মামলার খরচ জোগাতে জোগাতে রাখাইনরা একে একে নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। তাদের পাশে কেউ নেই, তাদেরকে দেখারও কেউ নেই। বেহাল যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে যেন রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রহীন এই রাখাইন জনপদ।

৭. ভূমি দখলকে কেন্দ্র করে নারীর উপর সসিংহতা

আদিবাসীদের ভূমি জবরদখল ও তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে তথা জাতিগত নির্মূলীকরণের অংশ হিসেবে ভূমিগ্রাসীরা আদিবাসী নারীর উপর হামলা, ধর্ষন, হয়রানি, অপহরণ ইত্যাদি কার্যক্রমকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। তারই অংশ হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে আদিবাসী নারীর উপর সহিংসতার মাত্রা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল এই চার মাসের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সমতল অঞ্চলে কমপক্ষে ১৯ জন আদিবাসী নারী যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে। তম্মধ্যে ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা, ৯ জনকে ধর্ষণ ও ৭ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা ও ১ জনকে অপহরণ করা হয়েছে। অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় এই চার মাসে আদিবাসী নারীর উপর সহিংসতার ঘটনা সবচেয়ে বেশি।

আদিবাসী নারীর উপর সহিংসতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো এসব মানবতা বিরোধী সহিংসতায় জড়িত অপরাধীদের বিচারের আওতায় না আনা। এভাবে অপরাধীরা পার পেয়ে যাওয়ায় সারা দেশে আদিবাসী নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত গত ৪ মাসে আদিবাসী নারীর উপর ১৮টির অধিক সহিংস ঘটনার পরিসংখ্যান তার সাক্ষ্য বহন করে।

৮. সুপারিশ

আদিবাসী জাতিসমূহের ভূমি হারানোর পেছনে অন্যতম যে কারণ তা হচ্ছে ঔপনিবেশিক জাতিরাষ্ট্র ধারণা। এই জাতিরাষ্ট্রের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রসমূহের মূল নীতি হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহকে দমন-পীড়ন ও বঞ্চনার মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে অঙ্গীভূত করা নতুবা তাদের জাতীয় অস্তিত্ব চিরতরে চিশ্চিহ্ন করে দেয়া। ফলে আজ আদিবাসীদের জাতীয় অস্তিত্ব ও তাদের চিরাচরিত ভূমি অধিকার চরমভাবে বিপন্ন ও হুমকির সম্মুখীন।

পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আদিবাসীদের "অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের" সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়টি অর্থহীন হয়ে যায় যদি আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, ভূমি, বন ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার তথা সকল ক্ষেত্রে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা এবং স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতির অধিকারের বিষয়টি অস্বীকৃত থাকে। তাই সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে আদিবাসী জাতিসমূহের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে আদিবাসী জাতিসমূহের জাতিসত্তা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ ভূমি, বন ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ব্যাক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকারের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য দেশের আদিবাসী ও নাগরিক সমাজ সরকারের কাছে জোর দাবি জানিয়ে আসছে।

নিম্নে আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন করা জরুরী-

১. আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত ভূমি অধিকারের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন ও বাস্তবায়ন করতে হবে;

২. বেহাত হওয়া সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের জায়গা-জমি পুনরুদ্ধার ও ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে;

৩. অর্পিত সম্পত্তির নামে বেহাত হওয়া সমতল অঞ্চলের আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের ভূমি ফেরত দেয়ার কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে;

৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে সময়সূচি-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বা রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে;

৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি এবং ৩০ জুলাই ২০১২ তৎকালীন আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় চূড়ান্তভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৩-দফা সংশোধনী প্রস্তাব মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন করতে হবে;

৬. আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ ও ইউএনড্রিপে সন্নিবেশিত আদিবাসীদের ভূমি অধিকারের সাথে সঙ্গতি বিধানের লক্ষ্যে ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন এবং এই আইন সমতল অঞ্চলের সকল জেলায় যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে;

৭. আদিবাসী অঞ্চলে সরকারি ও বেসরকারি কোনো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে আদিবাসীদের স্বাধীন মতামত গ্রহণ এবং প্রকল্পে আদিবাসীদের অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;

৮. নারীর উপর সহিংসতাসহ আদিবাসীদের উপর ভূমি কেন্দ্রীক হামলার ঘটনা যথাযথ তদন্ত ও হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে;

৯. আদিবাসী অধিকার আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং আদিবাসী অধিকার বিষয়ক জাতীয় কমিশন গঠন করতে হবে।

তারিখ: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪।